।। ভূমিকা ।।

প্রাচীন ভারতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দশরূপকের উল্লেখ পাওয়া যায়। রূপক বা প্রচলিত ভাষায় 'নাটকে'র দশটি ভেদ প্রমাণ করে জনসমাজে এর কতটা কদর ছিল। এই কদরের ফলেই এত রকম বৈচিত্র্যের মাধ্যমে অভিনেয় বিষয় বা শ্রব্যকাব্যের এত প্রকারভেদ দেখা যায়। নাটক ও প্রকরণের সমাদর বেশি থাকলেও ভাণসাহিত্য সমাদৃত হয়েছে তার বাস্তবধর্মিতার জন্য। ঋগ্বেদের সংবাদসূক্তগুলির মধ্যেই রূপকের প্রাচীনতম প্রকাশ।

আমাদের দেশের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যেও বহু নাট্যধর্মী উপাদান রয়েছে। মহাকাব্যকে ইংরাজীতে 'এপিক' বলা হয়। আধুনিক যুগের নাট্যকার ব্রেশ্‌ট্‌ 'এপিক' শব্দটিকে রূপক বা থিয়েটারের ক্ষেত্রে যোগ করেছেন। মহাকাব্য মূলত বর্ণনাধর্মী। মহাকাব্যের গাম্ভীর্যের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে তার বর্ণনার রীতি চলতে থাকে। বিরাট একটা সময়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, তাদের সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন মহাকাব্যে দেখতে পাওয়া যায়। মহাকাব্যের নানা ছোট-বড় চরিত্র তাদের দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে সমকালীন আচার-আচরণ ও মানসিকতা নিয়ে আসন পাতে বর্ণনায় ও চিত্রধর্মিতায়। ভারতের যেমন রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীসেও তেমনি ছিল ইলিয়াড ও ওডিসি। এই বর্ণনামূলক মহাকাব্যের কাহিনী বিভিন্ন পর্যায়ে গীত হত অথবা বিবৃত হত বীণা ও মৃদঙ্গ সহযোগে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাণসাহিত্যেও দেখা যায় নায়ক বিট সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের চরিত্র ফুটিয়ে তোলে আকাশভাষিত ও তার সুনিপুণ বর্ণনার মাধ্যমে; নেপথ্যে থাকে বীণা ও মৃদঙ্গের ধ্বনিমাধুর্য।

মহাকাব্যের কাহিনী যেমন বীণা ও মৃদঙ্গ সহযোগে গীত বা বিবৃত হত তেমনি শ্রব্যকাব্যেও যুক্ত হত কথকের আঙ্গিক ও বাচিক ক্রিয়া। ফলে টুকরো টুকরো দৃশ্যকাব্যের চিত্রকল্প ভেসে উঠত শ্রোতাদের মনে। এই কথকতার ভঙ্গিমা বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির রসে জারিত। পূর্বভারতে যেমন লোকনাট্যের ঢং-এ এগুলি পরিবেশিত হত তেমনি অন্যান্য অঞ্চলেও আঞ্চলিক লোকবৈশিষ্ট্য প্রধান হয়ে উঠত। মহাকাব্যের এই বর্ণনামূলক অভিনয়ে জাতিধর্ম বা বয়স নির্বিশেষে সকলে সুখদুঃখের অনুভূতি বা ধর্মচর্চার অনুভূতি লাভ করত।

শুধুমাত্র চরিত্রের দ্বন্দ্ব বা মাহাত্ম্যের জন্য নয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেরও একটা বিশেষ স্থান এই অনুভূতি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রবল। তাই সাধারণ শ্রোতা যখন কথকের আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয় লক্ষ্য করছেন তখন তিনি কেবল যে চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছেন তা নয়, ঘটনার প্রবহমানতার সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছেন। এই মাহাত্ম্যের জন্যই মহাকাব্যগুলি কালজয়ী হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে, মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর।"

"কালের যাত্রার ধ্বনিতে মহাকালের মহাকাব্য মুখর হয়ে রইল ভারতবর্ষের সর্বত্র ধ্রুপদী ও আঞ্চলিক ভাষায়। বেদ, উপনিষদ তথা প্রাচীন সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য প্রায় দেড়-দুই হাজার বছর যেভাবে বংশপরম্পরায় স্থিতি লাভ করেছে তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।" ডঃ সুকুমার সেনের মতে — ঋগ্বেদের রচনা ও গ্রন্থনকাল এবং তাহার বেশ কিছুকাল পরেও আর্য ভারতীয়রা লিখিতে জানিতেন না। ঋগ্বেদের সূক্ত মুখে মুখে রচিত এবং মুখে মুখেই গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে আগত। এমন আশ্চর্য অন্য কোন দেশে ঘটে নাই। হাতে লেখার কথা দূরে থাক যত্ন করিয়া ছাপা হইলেও ভুল এড়ানো যায় না। কিন্তু একটানা প্রায় দেড়-দুই হাজার বছর ধরিয়া ঋগ্বেদের মত গ্রন্থ (এবং সেই সঙ্গে বিরাট বৈদিক সাহিত্যের অপর ভারী ভারী গ্রন্থ) পরিশুদ্ধভাবে মুখে মুখেই পুরুষানুক্রমে কালবাহিত হইয়া আসিয়াছে। মৌখিক পরিবহণে যাহাতে ভ্রমপ্রমাদের অবকাশ না ঘটে তাহার জন্য সেকালের বেদজ্ঞরা বিস্তর সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।" এহেন সংস্কৃত সাহিত্য ছাপার অক্ষরে গ্রন্থভুক্তি না হওয়ায় মূলতঃ সীমাবদ্ধ রইল পণ্ডিতদের মধ্যে। রামায়ণ-মহাভারতও বেশ কিছুকাল সেইভাবেই ছিল। খ্রীস্টপূর্ব কয়েকশ বছর থেকে ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাটকের প্রচলন শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে একথা বলা যায়। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে অশ্বঘোষের (আনুমানিক প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতাব্দী) পূর্বের নাট্যকার কয়েকজনের নাম জানা গেলেও তাঁদের কোন পুঁথি এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের দৃশ্যরূপও সাধারণ মানুষ উপভোগ করতে পারত না। তা শিক্ষিত অভিজাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল — এ ধারণা কোন কোন পণ্ডিত মনে করলেও সংস্কৃত ভাণসাহিত্য থেকে এর বিপরীত ধারণাই বলবতী হয়। ভাণগুলির

অভিনয় হত সাধারণতঃ কোন দেবদেবীর মন্দিরে তাঁদের বিশেষ যাত্রা বা উৎসব উপলক্ষ্যে। অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেখানে বিপুল জনসমাগম হত। সেখানে দেশের রাজা থেকে আরম্ভ করে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিও যেমন দেবমন্দিরে পূজা দিতে আসতেন তেমনি বিটপীঠমর্দবিদূষক ও গণিকার দল এবং সাধারণ মানুষও দেবদর্শনের জন্য উপস্থিত হত। দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও নারীপুরুষ নির্বিশেষে মানুষ সপরিবারে উপস্থিত হত দেবদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও বিনোদনের বিভিন্ন বিষয় উপভোগের জন্য।

সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে বলা হয়েছে — ''সংস্কৃত নাটকের অসাধারণ উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও একথা মনে না করিয়া পারা যায় না যে এই নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ও আবেদন অতি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। জাতির ভাব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করাই যদি নাটকের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে, তবে এই নাট্যসাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্য বলা চলে না।

সংস্কৃত নাটক কোনকালেই জনসাধারণের ভোগ্য ছিল না। রাজন্যবর্গ বিত্তশালী নাগরিক এবং কতকাংশে ধর্মগোষ্ঠী ছিল নাটকের পোস্টা ও রসভোক্তা। এক কথায় সংস্কৃত নাটক ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের সম্পত্তি। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলা নিজস্ব উৎকর্ষের গুণে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। বলতে গেলে ভারতীয়েরা সমগ্র পূর্ব এশিয়ার যেমন ধর্মগুরু ছিলেন তেমনি নাট্যগুরুও ছিলেন।''

উক্ত বক্তব্যকে আংশিক সত্য রূপেই স্বীকার করা ভালো কারণ সংস্কৃত নাটকপ্রকরণাদি যদি রাজদরবারে বা অনুরূপ পরিবেশ অভিনীত হয় তাহলে সেখানে তার উপভোগ যে উচ্চবর্গের ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একথা সত্য। কিন্তু কোনো দেবতার বা দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে যে অভিনয়ের আয়োজন হত সেখানে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীও ইচ্ছা করলে দর্শকরূপে উপস্থিত থাকতে পারতেন বলেই মনে হয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে যথোচিত প্রচারের অভাব এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের অনীহার ফলে সংস্কৃত রূপকগুলির মহাকাব্যের মতো ব্যাপক প্রচার লাভ সম্ভব হয় নি। এর অন্যতম কারণ হয়তো রামায়ণ মহাভারত সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মগ্রন্থ রূপেই অধিক সমাদৃত, মহাকাব্যরূপে ততটা নয়।

সমাজপতিরাও মহাকাব্যকে লোকশিক্ষার হাতিয়ার রূপে যতটা ব্যবহার করেছেন রূপককে ততটা নয়। তাই অমৃতসমান মহাভারতের কথা পুণ্যার্জনকারীদের যতটা আকর্ষণ

করেছে, সংস্কৃত নাটকের সেই আকর্ষণী শক্তি ছিল না।

মহাকাব্যের এই গল্প বলার রীতি তার সমাজচিত্র, দেবতা-মানুষের আত্মীয়তার কথা এবং লোককল্যাণের কথা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে তার আবেদনকে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছে। সংস্কৃত ও আঞ্চলিক ভাষা — উভয়েই সুপণ্ডিত ব্যক্তিরাও সাধারণ মানুষের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষায় মহাকাব্যকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছেন। ফলে এগুলির সর্বজনগ্রাহ্যতা সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। শ্রোতারা কেবল আবেগতাড়িত হতেন না, তাঁরা ঘটনার মূল্যায়নও করতেন। সংস্কৃত রূপকের ক্ষেত্রে অবশ্য এতটা সাফল্য অর্জন সম্ভব হয় নি।

অভিনয় :

'অভিনয়' কথাটা যত সহজে উচ্চারণ করা যায় ব্যাপারটা আসলে তত সহজ নয়। 'অভিনয়' শব্দটির পিছনে আছে কম করেও আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস, এ ব্যাপারে অধ্যবসায়, বিশ্লেষণ ও শিক্ষা। প্রাচীন গ্রীক অভিনয় পদ্ধতি ও প্রযোজনা এবং প্রাচীন ভারতীয় অভিনয় পদ্ধতি ও প্রযোজনা থেকে আরম্ভ করে একবিংশ শতাব্দীর আর্ট থিয়েটারের নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা — সবই এর অঙ্গীভূত। রূপকের দুটি রূপ — অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ।

রূপকের অন্তরঙ্গ পরিবেশ রচনা :

বিষয়বস্তুর ক্রমাগত বিশ্লেষণ ও মিশ্রণের রীতিকেই রূপকের অন্তরঙ্গ পরিবেশ রচনা বলা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় গভীর থেকে গভীরতর স্তরে প্রবেশ করতে হয়। বাইরের জীবন থেকে মননের জীবনে, দেহ থেকে দেহাতীত কল্পনায় চরিত্রের উপলব্ধি করতে হবে। তবেই অভিনয়ে আবেগের সার্থকতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দেহ থেকে দেহাতীত কল্পনায় বা জীবন থেকে মননের জীবনে — অভিনয়ের এই সচেতনতা প্রাচীন ভারতীয় অভিনয়ে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে আঙ্গিক, বাচিক, সাত্ত্বিক ও আহার্য — চারপ্রকার অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে। আচার্য ভরত বলেন সত্ত্ব হচ্ছে অব্যক্ত রূপ। কিন্তু স্থানের উপযোগী রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বেদ, কম্প প্রভৃতি চিহ্নের দ্বারা এবং রসের সঙ্গে সুসংহত হয়ে বিভিন্ন ভাব রসকে আশ্রয় করে থাকে। মন সমাহিত না হলে সত্ত্বের নিষ্পত্তি হয় না। অভিনবগুপ্ত বলেছেন — সত্ত্ব ও চিত্তের একাগ্রতা একই বস্তু। অধ্যাপক অবন্তীকুমার সান্যাল ব্যাখ্যা করেছেন —

চিত্তের একাগ্রতা বা সমাহিতি ছাড়া রোমাঞ্চ অশ্রু স্বেদ বৈবর্ণ্যের অভিনয় কোনমতেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আঙ্গিক অভিনয়গুলি নিছকই অঙ্গভঙ্গিতে পরিণত হয়।

নাটকের বহিরঙ্গ রূপ :

নাটকের অন্তরঙ্গ রূপের মতো একটি বহিরঙ্গরূপও বিদ্যমান। নাট্যকার তাঁর নাটকের বহিরঙ্গে দেশ-কালের পরিচয় দিয়ে ফেলেন। চেতনভাবে বা অবচেতনভাবে যে কোনো সৎ সাহিত্যে তা এসে থাকে। সাহিত্যে একে বলা হয় কাল-চেতনা। রূপকের বিষয় রূপকের মধ্যেই নিহিত। সেটি অন্তরঙ্গ রূপ। বহিরঙ্গ রূপটিও অন্তরঙ্গ রূপের বিশ্লেষণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

নাট্যকার যে সমাজের সাধারণতঃ রূপকে সেই সমাজের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার, ত্রুটি-বিচ্যুতির চিত্র এসে যায়। নাট্যকারের সংবেদনশীল চেতনায় সমাজের সঙ্কট ধরা দিতে বাধ্য, আর সেই সঙ্কটের মধ্যে সমাজের চিত্রও এসে যাবেই। সেই চিত্রের বাস্তবতা বিশ্লেষণী মানসিকতায় অনুধাবন করাই হল বহিরঙ্গ পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

অভিনেতা বা নটের দায়িত্ব :

কোন মতে অভিনেতা বা নট নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন অর্থাৎ তিনি মনে করবেন যে তিনিই রাম বা তিনিই ম্যাকবেথ। আবার কেউ কেউ মনে করেন অভিনয়রীতিতে অভিনেতার নিজস্ব সত্তার আন্তর ও বাহ্যক্রিয়া এবং তাঁর গৃহীত ভূমিকার আন্তর ও বাহ্য ক্রিয়া সমান মূল্যবান। অভিনেতা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, পরিবেশ ও মানসিকতা ভালোভাবে অনুধাবন করে অঙ্গ সঞ্চালন ও ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে চরিত্রের আন্তরসত্তার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হবেন। অভিনেতার কতকগুলি মৌলিক গুণের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে তাঁর প্রবল ও সক্রিয় কল্পনাশক্তি অভিনেতাকে সঠিক ক্রিয়া ও অভিব্যক্তির সাহায্যে চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে। অভিনেতা যখন মঞ্চে অভিনয় করবেন তখন মঞ্চের পরিবেশের মধ্যেই তাঁর অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। অভিনেতার অর্থহীন শূন্যদৃষ্টি দর্শকদের মনোযোগ ও আগ্রহ শিথিল করে তোলে। অভিনেতাকে ব্যক্তিজীবনে তাঁর পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণশীল হতে হবে। তবেই তাঁর আন্তর মনোযোগ সূক্ষ্ম ও গভীর হবে।

অভিনেতার পেশীসঞ্চালন সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করতে হবে। অভিনয় যে শুধু

বাস্তবনিষ্ঠ হবে তা নয়, তাকে শিল্পসম্মতও হতে হবে। সেজন্য অভিনেতাকে তাঁর নিজস্ব রুচি শিল্পবোধ ও সৃজনশক্তি দিয়ে তাঁর অভিনয়কে করে তুলতে হবে সুন্দর ও শিল্পসার্থক। বিকৃতি, কৃত্রিমতা ও আতিশয্য সম্পূর্ণ পরিহার করা উচিত।

সংলাপ বলতে বলতে চোখের তারার ও ভ্রূর অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত সঞ্চালন বর্জন করতে হবে। প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে যে আঙ্গিক অভিনয় আছে তার প্রয়োজন তৎকালে অবশ্যই ছিল। পরবর্তীকালে পদ্ধতিগত অভিনয়ে আঙ্গিক অভিনয়ের রেওয়াজও ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের বাস্তববাদী অভিনয়ে অঙ্গসঞ্চালনকে সীমিত করা হয়েছে, অর্থাৎ চরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন আলাদা করে চোখে না পড়ে। দর্শককে অভিনয় অপেক্ষা যেন অঙ্গ সঞ্চালন দেখতে না হয়।

বর্তমান যুগে নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগঃ

আধুনিকযুগে বিশ্বের নাট্যতত্ত্ব ও প্রয়োগরীতির উপর স্তানিস্‌লাভস্কি ও ব্রেশ্‌টের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্রথম জন অভিনেতা ও পরিচালক এবং দ্বিতীয় জন নাট্যকার ও পরিচালক। আধুনিক বিশ্বনাট্য আন্দোলনে দুই বিপরীত প্রান্তে বিরোধী নাট্যধারার প্রবর্ত্তকরূপে তাঁদের অবস্থান। স্তানিস্‌লাভস্কির প্রয়োগের মূল কথা হল সংযুক্তিকরণ আর ব্রেশ্‌টের মূল কথা বিযুক্তিকরণ। স্তানিস্ লাভস্কি বলেছেন, অভিনেতা চরিত্রের ভাবনা ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবেন আর ব্রেশ্‌টের মতে অভিনেতা চরিত্রের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকবেন। স্তানিস্-লাভস্কির অভিনেতা মঞ্চ-পরিবেশের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে একাত্ম হয়ে থাকবেন। কিন্তু ব্রেশ্‌টের অভিনেতা তাত্ত্বিক ভাষা ও তির্য্যক্ মন্তব্যের দ্বারা মঞ্চের ঘটনা ও চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের সজাগ ও সতর্ক করে রাখবেন। স্তানিস্‌লাভস্কির রীতিতে মঞ্চে অভিনীত নাট্যকাহিনীর মধ্যে বাস্তবের বিভ্রম সৃষ্টি করাই হল মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্রেশ্‌টীয় রীতিতে দর্শকদের সচেতন করে দেওয়া হয় যে, মঞ্চে অতীতের কোন ঘটনাই অভিনীত হচ্ছে মাত্র। সেজন্য স্তানিস্‌লাভস্কির রীতি হল নাট্যধর্মী আর ব্রেশ্‌টের রীতি হল বর্ণনাধর্মী। স্তানিস্‌লাভস্কির উদ্দেশ্য হল অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের সম আবেগ ও অনুভূতিতে যুক্ত করা আর ব্রেশ্‌ট চাইলেন দর্শকদের আবেগ-অনুভূতি বিচ্ছিন্ন করে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তিকে সজাগ ও স্বতন্ত্র রাখতে।

আমাদের দেশে ব্রেশ্‌টের উদ্ভাবিত পদ্ধতির সার্থকভাবে প্রয়োগ হোক বা না হোক, বর্তমানের নাট্যকর্মীদের কাছে ব্রেশ্‌ট শুধুই একজন নাট্যকার বা নাট্যরীতির উদ্ভাবক নন। ব্রেশ্‌ট একটি নাম যা নাট্যজপমালায় সর্বদাই উচ্চারিত হচ্ছে এবং হবেও। এর কারণ হল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সামাজিক বাস্তববাদ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মেনে নিয়েছেন। শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিকাশে ব্যক্তিগত চিন্তাধারার তুলনায় সামাজিক চিন্তার প্রক্ষেপণের প্রয়োজন অনেক বেশি। মানুষ শিল্পের মধ্য দিয়ে সমাজদর্পণে তার অস্তিত্বের সংকট উপলব্ধি করতে পারবে। নিজেকে চিনতে পারবে বহুর ঐক্যে।

বর্তমান কালে নাট্যসাহিত্যে সমাজের সমস্যার প্রতিবিম্বন আরম্ভ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে যেমন ইউরোপে তেমনি বাংলা নাটকেও। কিন্তু সামাজিক বাস্তববাদের গভীর তাৎপর্য ও ধ্যানধারণার প্রতীক হলেন ব্রেশ্‌ট। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, প্রাচীন সংস্কৃত প্রহসন ও ভাণগুলিতে সামাজিক বাস্তববাদের এই চিত্র তুলে ধরে সামাজিক ও ব্যক্তিগত অনাচার ও দুর্নীতিকে কশাঘাত করা আরম্ভ হয়েছে অনেককাল আগেই। ফলে বর্তমান নাট্যসমালোচকদের ব্রেশ্‌টকে নিয়ে এই মাতামাতির আগে আমাদের উচিত এই প্রাচীন নাট্যকারদের ভাবনাকে যথাযোগ্য সম্মান জানানো।

ব্রেশ্‌ট তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন লোকহিতকর নাটকে বর্ণনাত্মক রীতিতে পরিবেশন করলে দর্শক নাটকের চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে পারিবেশিক ঘটনার মূল্যায়ন করতে সমর্থ হবেন। চরিত্রের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্ম না হয়ে ঘটনাকে অন্য দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নাটকের লোকশিক্ষার দিকটা উদ্ভাসিত হবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে শিক্ষালাভের জন্য তো বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়াদি রয়েছেই, থিয়েটারে কেন? আসলে লোকশিক্ষার মাধ্যম হল রূপক কারণ পড়া বা শোনার থেকে কোন জিনিস প্রত্যক্ষ করলে মনের ওপর তার প্রভাব পড়ে অনেক বেশি। স্বাভাবিকভাবেই রূপকের চিত্রায়িত রূপ দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করে অনেক বেশি কারণ এর লোকরঞ্জনের দিকটিও উপেক্ষিত নয়। এই শিল্পের মাধ্যমে সমাজের তীব্রতম সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ যেমন সম্ভব তেমনি আনন্দলাভের বিষয়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আধুনিক দুই প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যে প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের বেশ কিছু মিল লক্ষ্য করা যায় তা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে পরিস্ফুট

হয়েছে। এই দিক থেকে বলা যেতে পারে সংস্কৃত প্রহসন ও ভাণগুলির কিছু বর্ণনা বর্তমান দৃষ্টিতে অশ্লীল মনে হলেও তৎকালীন সামাজিক অবস্থাকে বুঝতে বিশেষ সহায়ক। কিছু কিছু সমস্যা যেমন দুষ্ট ব্যক্তিদের মহিলাদের উত্যক্ত করা, আদালতের কর্মচারীদের ঘুষ নেওয়া, অযথা পাণ্ডিত্যের ভাণ করে ভণ্ডামি করা ইত্যাদি বর্তমানযুগেও সমান প্রাসঙ্গিক।

আমাদের গবেষণার বিষয় 'সংস্কৃত সাহিত্যে ভাণ'। এই বিষয়টিকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : ভাণ। এই অধ্যায়ে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের বিভিন্ন গ্রন্থে কাব্যলক্ষণ, রূপকের প্রকারভেদ ও ভাণের লক্ষণ সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলা আছে সেগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভাণের উৎপত্তি, ভাণের স্থান এবং বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : চতুর্ভাণীতে ভাণের লক্ষণ সমন্বয়। এখানে ভাণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে চতুর্ভাণীতে সেগুলি কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। ভাণের মুখ্যরস ও গৌণরস, বিষয়বস্তু, সন্ধি, লাস্যাঙ্গ, বৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করে চতুর্ভাণীতে এগুলি কীভাবে প্রযুক্ত হয়েছে — সেই দিকগুলি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : পদ্মপ্রাভৃতক। লেখক শূদ্রকের পরিচিতি, কাল ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর পদ্মপ্রাভৃতকের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উল্লেখ করে চরিত্রচিত্রণ, রস ও ভাবের প্রয়োগ, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে কবির নৈপুণ্য তথা রচনাশৈলীর দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : পাদতাড়িতক। এখানেও শ্যামিলকের পরিচিতি আলোচনা করে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর পূর্বের ন্যায় চরিত্রচিত্রণ, রস ও ভাবের ব্যবহার, ছন্দ ও অলংকার ব্যবহারে বৈচিত্র্যের দিকটি আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : ধূর্তবিটসংবাদ। আলোচ্য ভাণের রচয়িতা ঈশ্বরদত্তের পরিচিতি, কাহিনীসংক্ষেপ আলোচনার পর চরিত্র চিত্রণ, রস ও ভাবের সুষ্ঠু প্রয়োগ, ছন্দ ও অলংকারের ক্ষেত্রে নাট্যকারের রচনাচাতুর্য উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : উভয়াভিসারিকা। এই ভাণটির লেখক বররুচি। বররুচির পরিচিতি ও কালবিষয়ক আলোচনার পর কাহিনীসংক্ষেপ আলোচিত হয়েছে। এরপর যথাক্রমে চরিত্রচিত্রণ,

রসবিষয়ক আলোচনা, ছন্দ ও অলংকার প্রয়োগে নৈপুণ্যের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : ভাণসাহিত্যে সমাজচিত্র। এই অধ্যায়ে চতুর্ভাণির অন্তর্গত ভাণগুলিতে যে সামাজিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তার সঙ্গে কাদম্বরী, দশকুমাররচিত, মৃচ্ছকটিক, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, দামোদরগুপ্তের কুট্টনীমত, বুধস্বামীর বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের বিবরণের একটি তুলনাত্মক আলোচনা করা হয়েছে। ভাণগুলিতে প্রাপ্ত ভৌলোলিক বিবরণ, নগরবর্ণনা, প্রসাদবর্ণনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৎকালীন গণিকাদের জীবনযাত্রা, গণিকাপল্লীর বিবরণ, গণিকাদের সহযোগী নাগরক, বিট, পীঠমর্দ — এদের সম্পর্কেও আলোচনা আছে। চতুর্ভাণীতে তৎকালীন বেশভূষা, বিনোদন ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তারও তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কেও যে সামান্য কিছু কথা জানা যায় সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় : উত্তরকালীন ভাণ। এই অধ্যায়ে পরবর্তীকালে যে সমস্ত ভাণ রচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাণের একটি তালিকা দিয়ে তিনটি ভাণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। আরও কয়েকটি ভাণ সম্পর্কে অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করে চতুর্ভাণীর সঙ্গে এদের রচনাশৈলীর পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে।

পরিশেষে অতি সংক্ষেপে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে।